২

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অর্থনৈতিক পটভূমি

ভূমিকা

পাকিস্তানি শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান মারাত্মক অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা ছিলনা। কেন্দ্র সরাসরি এসব নিয়ন্ত্রণ করত বলে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। স্টেট ব্যাংক সহ প্রায় সকল ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি প্রধান এবং বিদেশী মিশনসমূহের হেড অফিস ছিল পশ্চিমে। ফলে অবাধ অর্থ পাচার সহজ হয়। পূর্বাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের ব্যাপারটি ছিল পশ্চিমের দয়ার ওপরে নির্ভরশীল। অন্যদিকে উদ্বৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় পশ্চিম পাকিস্তানে জমা থাকত, যে কারণে বাংলাদেশে কখনো মূলধন গড়ে উঠতে পারেনি।

এই প্রক্রিয়ায় যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ছিল অর্থনৈতিক স্বশাসন বা স্বায়ত্তশাসন। পূর্ব পাকিস্তান মুদ্রা, রাজস্ব নীতিতে প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সাহায্য নীতি দাবি করে। আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার না হলে অর্থনৈতিক শোষন বন্ধ বা সম্পদ পাচার বন্ধ হবে না এটি তারা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। ফলে ষাটের দশকে এসব দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক মুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যায়।

এই ইউনিট পড়ে আপনি পূর্ববাংলায় অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. পূর্ববাংলায় অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ:অর্থনৈতিক বৈষম্য
- পাঠ-২. পূর্ববাংলায় অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদঃ রাজনৈতিক, সামরিক, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য।

পাঠ-১

পূর্ববাংলায় অভ্যন্ত রীণ উপনিবেশবাদঃ অর্থনৈতিক বৈষম্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সম্পদ বিভাজন নীতি আলোচনা করতে পারবেন;*
- *শোষণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবেন;*
- *অর্থনীতি শোষনের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।*

১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্নে পূর্ববাংলার জনগণ আশা পোষণ করেছিল পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বাঙালির আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক মহল পূর্ববাংলাকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে ভাবতে থাকে এবং ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ শুরু করে। গবেষকরা একে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ হিসেবে আখ্যা দেন। পূর্ববাংলার জনগণ রাজস্ব আয়-ব্যয়, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ উন্নয়ন বাবদ ও উন্নয়ন প্রকল্প বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের বন্টন এবং আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শোষণের শিকার হতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক এরূপ শোষণমূলক নীতি অনুসরণের ফলে ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। এরূপ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে পূর্ববাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাধতে থাকে এবং এ আন্দোলন ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। যার সফল পরিণতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সম্পদ বিভাজন নীতি

পাকিস্তান রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল সবক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। ফলে রাষ্ট্রীয় সকল পরিকল্পনা প্রণীত হত কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরে। আর এ বিভাগে পূর্ববাংলার প্রতিনিধি না থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষী মহল কৌশলে পূর্ববাংলাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সম্পদ বিভাজনের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের তত্ত্ব ছিল যে, এক এলাকায় যে খরচ বা বিনিয়োগ হবে, অর্থনীতিটি অবিচ্ছেদ্য হওয়ায় তার সুফল দুইটি এলাকাতেই সমভাবে ভোগ করা যাবে। এ তত্ত্বে বিশ্বাসী পশ্চিমা শাসকবর্গ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রণীত পরিকল্পনাগুলোতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বৈষম্য নীতি অনুসরণ করে। পরিকল্পনাসমূহের বরাদ্দের খতিয়ান থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন পর্যন্ত পাকিস্তানে মোট তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়েছিল ১৯৫৫/৫৬ সন থেকে ১৯৫৯/৬০ সন পর্যন্ত। এ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন খাতে সরকারিভাবে মোট ৩০০ কোটি ২০ লক্ষ রূপী বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যয় ছিল ১১৩ কোটি ৩ লক্ষ ৮০ হাজার রূপী। অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগের মাত্র ৩৭%। অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন খাতে ব্যয় ছিল প্রকৃতপক্ষে ৫০০ কোটি রূপী। অন্যভাষায়, প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় সরকারিভাবে প্রতিবছরে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় ৪-৫ গুণ অর্থ বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছিল। আবার এই সময়ে ব্যক্তিগত মালিকানা খাতে পূর্ব পাকিস্তানে ৭৩ কোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৯৩ কোটি রূপি বিনিয়োগ করা হয়েছে।

পাকিস্তানের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকাল ১৯৬০/৬১ থেকে ১৯৬৪/৬৫ সন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সমালোচনা গড়ে উঠলে এবং আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ও অসন্তোষ দেখা দিলে আইয়ুব খান দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন। আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের দু'প্রদেশের মধ্যে সম্পদ বিভাজনের বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য একটি ফাইনান্স কমিটি গঠন করেন। কমিটির সুপারিশক্রমে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা অনুপাতে সম্পদ বিভাজনের কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বরাদ্দকৃত ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৯৫০ কোটি এবং ১৩৫০ কোটি রূপী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আইয়ুব খান দু'প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করার কথা ঘোষণা করা হলেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দের ৪৫% পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে। কিন্তু পরবর্তীকালে মোট খরচের মাত্র ৩১% ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে এবং বাকী অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছিল। এছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু নদীতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পে অতিরিক্ত ২১১ কোটি রূপী ব্যয় করা হয়েছিল। সুতরাং সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়ন কর্মকান্ডে মোট বরাদ্দের ৬৯% ব্যয় করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত খাতে পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল ৩০০ কোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১০৭০ কোটি রূপী। যথাক্রমে ২১.৯% ও ৭৮.১%।

শোষণের প্রক্রিয়া

১. রাজস্ব আয় ও ব্যয়: দু'টি যুক্তি প্রদর্শন করে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করতো। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজস্বের তুলনামূলক কম অংশ পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত হত। তাই পশ্চিমে বেশি রাজস্ব ব্যয় করা হলে তাতে পূর্ব পাকিস্তানের আপত্তির কারণ নেই। দ্বিতীয়ত, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ এসব বিষয়ে যে ব্যয় হয় তাতে দুই অঞ্চলেরই সমান মঙ্গল সাধিত হয়।

১৯৬৯ সালে জাতীয় পরিষদের প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকাশিত হয় বিগত তিন বছরের কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মোট পরিমাণ ছিল ৩৩৪৪ মিলিয়ন টাকা আর একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট অর্জন ছিল ৯১৫৭ মিলিয়ন টাকা। আবার রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে ১৯৭০ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৯৬৫-'৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে মোট রাজস্ব পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছিল ৬৪৮০ মিলিয়ন টাকা এবং একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছিল ২২২৩০ মিলিয়ন টাকা। তাই দেখা যায় যে, উলে-খিত সময়ে কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অবদান ছিল প্রায় ১/৩ ভাগ, কিন্তু এখানে ব্যয় হয়েছে ১/৫ ভাগ। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের যে রাজস্ব আয় দেখানো হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কোম্পানি তাদের আয়কর ও শুল্ক প্রদান করত পশ্চিম পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের একটা বড় অংশ পরোক্ষভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেতো। আবার, রাজস্ব

ব্যয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এমন কিছু ব্যয়ের ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের ওপর চাপানো হতো। যার দ্বারা পুর্ব পাকিস্তান বিন্দুমাত্র লাভবান হতো না, ওপরন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতো। যেমন– ১৯৬৫ সালে পাকভারত যুদ্ধে যে ব্যয় হয় তার একটা অংশ পূর্ব পাকিস্তানের ওপর চাপানো হয়। আবার, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনী মূলত, পশ্চিম পাকিস্তান কে রক্ষার্থেই ব্যবহৃত হতো সর্বদা। এক্ষেত্রে ব্যয় বহন করতে হতো পূর্ব পাকিস্তানকে। অনুরূপ এ অঞ্চলে কাঁচামাল থাকা সত্বেও কারখানা স্থাপন না করে অধিকমূল্যে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করা হতো। অনুরূপভাবে, কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি । কিন্তু সরকার পরিচালনার একটা অংশ পূর্বাঞ্চলকে বহন করতে হতো। এভাবে রাজস্ব আয়ে ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করা হতো।

২. বৈদেশিক সাহায্যের বিভাজন ও ব্যবহার: পাকিস্তানের তেইশ বছরে জাতি প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং দাতাদেশসমূহ পাকিস্তানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনগণের দুর্দশা লাঘবের লক্ষে নগদে ও পণ্যে এ সাহায্য দিয়েছিল। পাকিস্তানে বাঙালিরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অপেক্ষাকৃত গরীব। বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ নীতিগতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের পাওয়ার কথা থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়মিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। ওপরন্তু এ বৈদেশিক ঋণ ও ঋণের সুদের সিংহভাগ বহন করত পূর্ব পাকিস্তান। কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। যেমন– ১৯৬৫ সালে ৬ কোটি মার্কিন ডলারের চীন সাহায্যের প্রায় সম্পূর্ণটাই ব্যবহৃত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে । সেখানে ৯০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে একটি ভারী মেশিনারী কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছিল। অপরদিকে মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার বরাদ্দ করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য। কিন্তু সম্পূর্ণ ঋণই পরিশোধ করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের পাট ও পাটজাত দ্রব্য দিয়ে। জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা ১৯৬৪ সনে পাকিস্তানকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ঋণ দিয়েছিল। তারমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয়েছিল ৪৫ লক্ষ এবং বাকি ৮৫ লক্ষ দেয়া হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে । ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বৃটেন মোট ৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউন্ড সাহায্য দিয়েছিল, যার প্রায় সম্পূর্ণটাই ব্যবহৃত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কাজে। একই সময়ে মার্কিনী সাহায্যের ৬ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ব্যয় করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে বাঁধ নির্মাণ কাজে আর মাত্র ৯০ লক্ষ ডলার ব্যয় করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য।

পাকিস্তানের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রচুর বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য পেয়েছিল। ১৯৭০ সালের জুলাই পর্যন্ত এই হিসাব পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫৫০ হাজার কিলোওয়াট এবং বিদ্যুৎ লাইন ছিল ৩৮ হাজার মাইল। অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৯৫৬ হাজার কিলোওয়াট এবং বিদ্যুৎ লাইন ছিল ৬৩ লক্ষ ১২ হাজার মাইল।

এভাবে ১৯৪৭-৪৮ সাল হতে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ ও অঞ্চলভেদে বিভাজনের একটি চিত্র নিম্নের সারণিতে তুলে ধরা হল–

পাকিস্তানে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ

প্রাপ্তির খাত	মোট	কেন্দ্রীয় সরকার	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রকল্প সাহায্য	১১৩৩	১০৮	৪১৭	৬০৮
অপ্রকল্প সাহায্য	১১৩৪	৫৩	৪০৮	৬৭৩
পিএল ৪৮০ খাদ্য	১২৪১	৫	৪৪৫	৭৯১
গ্যারান্টি প্রদত্ত ঋণ	৯৮৬	১১	৩৫২	৬২৩

প্রকল্প অনুদান ও কারিগরি সাহায্য	৩৯৬	২০০	৫৬	১৪০
দ্রব্য অনুদান	৭৯৩	১৫	২৬৩	৫৭৫
সিন্ধু অববাহিকা কার্যক্রম	৭৫৬	-	-	৭৫৬
মোট	৬৪৩৯	৩৯২	১৯৪১	৪১৬৬

ছয়শালা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ ছিল এর মূলনীতি। পাকিস্তানের প্রায় ২০ বছরের পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের নিম্নলিখিত সারণি থেকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে-

পাকিস্তানের উন্নয়ন ১৯৫০-৭০ (মিলিয়ন টাকা হিসেবে)

বছর		পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫০-৫৫	সরকারি খাতে পরিকল্পনা	৭০০	২০০০
	পরিকল্পনা বহির্ভূত	০	০
	বেসরকারি খাত	৩০০	২০০০
১৯৫৫-৬০	সরকারি খাতে পরিকল্পনা	১৯৭০	৪৬৪০
	পরিকল্পনা বহির্ভূত	০	০
	বেসরকারি খাত	৭৩০	২৯৩০
১৯৬০-৬৫	সরকারি খাতে পরিকল্পনা	৬২৫০	৭৭০০
	পরিকল্পনা বহির্ভূত	৪৫০	২৩১০
	বেসরকারি খাত	৩০০০	১০৭০০
১৯৬৫-৭০	সরকারি খাতে পরিকল্পনা	১১০৬০	১৯১০০
	পরিকল্পনা বহির্ভূত	০	৩৬০০
	বেসরকারি খাত	৩০০০	১৬০০০
মোট	সরকারি খাতে পরিকল্পনা	১৯৯৮০	২৪৪৪০
(১৯৫০-৭০)	পরিকল্পনা বহির্ভূত	৪৫০	৫৯১০
	বেসরকারি খাত	৯৫৩০	৩১৬৩০

ওপরের সারণি থেকে বোঝা যায় যে, ১৯৫০-৭০ পর্যন্ত ২০ বছরে তিনটি খাতে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৯৯৬০ মিলিয়ন টাকা। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৬১৯৮০ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ ২০ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানে ৩২০২০ মিলিয়ন টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে।

৩. আমদানি-রফতানি ব্যবসার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শোষণ: পাকিস্তানে বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত দফতর থেকে পরিচালিত হতো। ফলে বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা সর্বদা পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে থাকতো।

পাকিস্তানের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত মোট রপ্তানি আয়ের ৬০ শতাংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের আর বাকি ৪০ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানের । ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে বহি:বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশক্রমে কমতে থাকে । কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তখন কাঁচামাল অপেক্ষা প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যের চাহিদা

ছিল সর্বাধিক। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত রেখে সকল কলকারখানা গড়ে তোলে পশ্চিম পাকিস্তানে । তারপরও ১৯৭০ সালের দিকে বহির্বাণিজ্যের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৫৩৭০ মিলিয়ন ডলার। এছাড়া বৈদেশিক সম্পদ প্রবাহ ছিল ১৬০০ মিলিয়ন ডলার, কিন্তু মোট আমদানি ব্যয় ছিল ৪২১৬ মিলিয়ন ডলার। সুতরাং এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি উদ্বৃত্ত থাকে ২৭৫৪ মিলিয়ন ডলার। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৪৪৪০ মিলিয়ন ডলার এবং আমদানি ব্যয় ছিল ৯৩১২ মিলিয়ন ডলার। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্য ঘাটতি থাকে ৪৮৭২ মিলিয়ন ডলার। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানের এ ঘাটতি পূরণ করা হতো পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত আয় থেকে।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান শোষণের শিকার হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পের কাঁচামালের যোগান দিতো। আর পশ্চিম পাকিস্তান তাদের উৎসাহিত পণ্য পূর্বাঞ্চলে চড়া দামে বিক্রি করতো। পূর্ব পাকিস্তানকে কাঁচামাল রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার অনুসরণ করতে হতো, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান এ ধরনের কোন নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করে এ অঞ্চলকে তাদের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করেছিল। ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তান সবসময় ঘাটতির সম্মুখীন হতো এবং তা রীতিমতো পরিশোধ করতে হতো।

৪. মুনাফা ও মূলধন আহরণের মাধ্যমে শোষণ: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে একই রাষ্ট্র হলেও পশ্চিমের কর্মচারী ও অফিসার পূর্বে কর্মরত থাকতো এবং তাদের মাসিক বা বাৎসরিক আয় পশ্চিমে চলে যেতো। পূর্বাঞ্চলে কাঁচামাল সস্তা থাকায় পশ্চিমা পুঁজিপতিরা এ অঞ্চলে কিছু শিল্পকারখানা গড়ে তোলে। কিন্তু উৎপাদিত পণ্য এখানে সরাসরি বিক্রি না করে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতো এবং পরবর্তীতে তা পশ্চিমাঞ্চলের রপ্তানি হিসেবে পূর্বাঞ্চলে আসতো এবং বিক্রিলব্ধ অর্থ আবার পশ্চিমে চলে যেতো। কখনো কখনো এ অঞ্চলে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার পর পুঁজিপতিদের বা সরকারের লক্ষ থাকত যতো শীঘ্র পারা যায় মূলধন পরিশোধ করা। ঘটনাটি ঘটেছে আদমজি জুট মিল স্থাপনের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে লক্ষ স্থির হয় প্রতিষ্ঠার তিন থেকে ৭ (সাত) বছরের মধ্যে সমুদয় বিনিয়োগ উসুল করা। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করা হয়েছিল।

মুলধন আহরণের ক্ষেত্রেও পূর্বাঞ্চলের লোকজন শোষণ ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধান প্রধান ব্যাংক, বীমা পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপিত ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের অধিকারে থাকায় ঐ অঞ্চলের শিল্পপতিরা সহজে ঋণ নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৭০ সনে দেখা যায় পাকিস্তানের ৩৬টি তালিকাভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল ১৫টি। এসব ব্যাংকের মধ্যে ১০টি পশ্চিম পাকিস্তানি মালিকানাধীন ছিল যেখানে ৭৫% মূলধন জমা হতো। বাঙালি মালিকানাধীন ছিল মাত্র দু'টি ব্যাংক যাতে জমাকৃত মূরধনের হার ছিল ১৬.৬% এবং বিদেশি তিনটি ব্যাংকের জমাকৃত মূলধনের হার ছিল ৮.৪%। ১৯৭০ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত পাকিস্তানের মোট ব্যাংকিং জমার ৩৬% এবং ব্যাংকিং ঋণের ২৬.৬% পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাংকগুলোতে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের পক্ষে ব্যাংকের সুযোগ সুবিধা ভোগ করা সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানে ১১টি বিদেশি ব্যাংকের সদর দফতর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং এসব ব্যাংকের ১৯টি শাখা ছিল পশ্চিমে আর ১২টি পূর্বাঞ্চলে। কাজেই বিদেশী ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি সুবিধা ভোগ করতো।

ব্যাংকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও পূর্বাঞ্চলের পুঁজিপতিরা বৈষম্যের শিকার হতো। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন বিনিয়োগকারী তার ১০% মূলধন দেখিয়ে ৯০% ঋণ নিয়ে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে পারতো। পূর্বাঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের এ সুযোগ সচরাচর দেয়া হতো না।

কাজেই দেখা যায় যে, মূলধন আহরণ ও মুনাফা অর্জন উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ববাংলার জনগণ শোষণের শিকার হয়েছিল।

৫. উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে শোষণ: পাকিস্তানের সকল অর্থনৈতিক নীতিমালার উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধি। ২য়সালা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ ছিল তার মূলনীতি। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়ন কর্মকান্ডে আঞ্চলিক বন্টন থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দু'অংশের জন্য বরাদ্দ– ১৯৬০/৬৫–১৯৬৫/৭০ (বরাদ্দ মিলিয়ন রুপী)

	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৬০–৬৫)		তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬৫–৭০)	
	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
সরকারি খাত	৬,৭০০	১০,৮০০	১১,৩০০	১৩,৭০০
বেসরকারি খাত	৩,০০০	১০,৭০০	৫,৬০০	১৬,০০০
মোট	৯,৭০০	২১,৫০০	১৬,৮০০	২৯,৭০০
মোট ব্যয়ের	৩১%	৬৯%	৩৬%	৬৩%

উল্লেখ্য যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আঞ্চলিক বরাদ্দ যাই থাকুক না কেন, বার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্বাঞ্চলের জন্য বরাদ্দ নানা অজুহাতে সীমিত রাখা হতো। আবার পূর্বাঞ্চলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করতো পশ্চিমাঞ্চলের লোকজন। ফলে অধিকাংশ পরিকল্পনা লাল ফিতা কাটার মাধ্যমে সমাপ্তি হতো। এছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ব্যাহত করা হতো। যেমন– যথাসময়ে তহবিল অবমুক্তি রোধ করে আর বিনিশ্চায়ক উপাদান (বৈদেশিক মুদ্রা বা নির্মাণ যন্ত্র বা নির্মাণ সামগ্রী সিমেন্ট আর ইস্পাত) যথা সময়ে পেতে না দিয়ে এবং কাজের সুবিধাজনক সময় নির্ণয় না করে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ব্যহত করা হতো। এর ফলে নির্দিষ্ট সময় শেষে দেখা যেতো অধিকাংশ প্রকল্পের অর্থ অব্যবহৃত থেকে যেতো। এ অর্থ পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন কাজে ব্যয় হতো।

পাকিস্তানের তেইশ বছরে সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে (বিশেষ করে সিন্ধু অববাহিকায়) প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল। আবার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগে যেসকল উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল, সেগুলো মূলত পশ্চিম পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিল।

৬. অবকাঠামোগত বৈষম্য: পাকিস্তানে পাকিস্তানেরর তেইশ বছরের শাসনামলে সরকারের ঔপনিবেশিকমূলক মনোভাব তথা উন্নয়ন প্রকল্পে পশ্চিমাঞ্চলকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়ায় উভয় অঞ্চলের মধ্যে অবকাঠামোগত বৈষম্য আকাশ-পাতাল ব্যবধানে উপনীত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই-দুইটি রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে তোলার কারণে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম মূলত পশ্চিম পাকিস্তানকে ঘিরেই পরিচালিত হয়। এছাড়া, ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস, সামরিক, নৌ এবং বিমান বাহিনীর সদর

দফতর, বিদেশী মিশনের প্রধান কার্যালয় প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তোলা হয়েছে শিল্প নগরী হিসেবে আর পূর্বাঞ্চলকে রেখেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পের কাঁচামালের যোগানদাতা ও উৎপন্ন পণ্যের বাজার হিসেবে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও পূর্বাঞ্চল বৈষম্যের শিকার হয়েছে। যেমন–

১৯৬০ সালে দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানে রেলপথ ৫৩৪৩.৮৯ মাইল, পূর্বাঞ্চলে ১৭১২.৫৫ মাইল। পশ্চিমাঞ্চলে পাকা রাস্তা ১০৬০৯ মাইল, পূর্বাঞ্চলে ২৩৮৮ মাইল। ১৯৬৫ সালে দেখা যায় পাকিস্তানের ২৩টি বেসামরিক বিমানবন্দরের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ১৮টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৫টি। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন উন্নীত হয়েছিল ৫৫০ হাজার কিলোওয়াটে, সেক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নীত হয়েছে ১৯৫৬ হাজার কিলোওয়াটে। একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারিত হয় ৩৮ হাজার মাইল আর পশ্চিমে ৬৩ লক্ষ ১২ হাজার মাইল। কাজেই অবকাঠামোগত দিকের উন্নয়নের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হয়েছে।

৭. জীবনমানের বৈষম্যঃ পাকিস্তানের তেইশ বছরের শাসনামলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনমানের বৈষম্য ছিল চরম অসম্মানজনক। পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা– শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা, অপিস-আদালত, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা ভোগ করতো। তাছাড়া কোন দেশের জীবনযাত্রার মান প্রণ্তানত নির্ভর করে ঐ দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ও দ্রব্যমূল্যেল ওপর। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে মাথাপিছু আয় ও দ্রব্যমূল্যের বিরাট ব্যবধান ছিল। বিষয়টি নিম্নবর্ণিত ছকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়–

পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য (টাকায়)

সময়	মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য
১৯৪৯/৫০	৬৩
১৯৫৯/৬০	৯০
১৯৬৯/৭০	২০২

দ্রব্যমূল্য (টাকায়)

পণ্যের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
চাউল (প্রতিমণ)	৫০	২৫
আটা	৩০	১৫
সরিষা তৈল প্রতিসের	৫	২.৫০
স্বর্ণ (প্রতি ভরি)	১৭০	১৩৫-৪০

অতএব, উপরোক্ত ছকের আলোকে বুঝা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে জীবনমানকে অনেক নিম্ন ছিল।

৮. সম্পদ পাচারঃ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম তেইশ বছরের ইতিহাস হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের যুগ। এসময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে নগদে ও জন্যে প্রচুর সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়। অর্থনীতির ভাষায় একে সম্পদ পাচার বলে। এক হিসাবে দেখা যায়, প্রতি বছর প্রায় ৩,০০০ মিলিয়ণ রুপি পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়। আর এক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত বিশ বছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মোট ১১.৮ বিলিয়ন টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয় যা পশ্চিম পাকিস্তানের

ঐ সময়কার মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ১৯ শতাংশ। এ অর্থ পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হলে এ অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ড ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পেতো।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার তত্ত্ব দেয় যে, রাষ্ট্রের এক এলাকায় যে খরচ বা বিনিয়োগ হবে, অর্থনীতিটি অবিচ্ছেদ্য হওয়ায় তার সুফল দুইটি এলাকাতেই উপভোগ করা যাবে। এ তত্ত্বের প্রথম প্রতিবাদ গড়ে উঠে ১৯৫৬ সালে চট্টগ্রামে একটি নিখিল পাকিস্তান অর্থনীতি সম্মেলনে। বাঙালি অর্থনীতিবিদ ড. মাজহারুল হক, ড. আবু সাদেক এবং ড. মির্জা নূরুল হুদা-এ তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেন। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক উক্ত তত্ত্বের প্রতিবাদে দুই অর্থনীতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তিনি ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের দু'প্রদেশের মধ্যে সম্পদ বিভাজনের বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য একটি ফাইনান্স কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের মূল সুপারিশ ছিল যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের যে অংশ প্রদেশে বিভাজন করা হবে তার সিংহভাগ পাবে পূর্ব পাকিস্তান । এ বিভাজন হবে জনসংখ্যা অনুপাতে। প্রকৃতপক্ষে কমিশনের রিপোর্ট ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনামলে কখনো এ নীতি কার্যকর হয় নি।

১৯৬৫ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হলে আঞ্চলিক বরাদ্দের প্রশ্নে জনগনের বিতর্ক সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও আঞ্চলিক অর্থ বরাদ্দের প্রশ্নকে পরিকল্পনা বিষয়ক বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসে। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিলক্ষিত বিনিয়োগের ৫১ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়ার কথা বলা হয় এবং সরকারি ব্যয়ের ৫৩ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানে হবে বলে নির্দিষ্ট হয়। বেসরকারি বিনিয়োগে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদ প্যানেলের আলোচনায় আঞ্চলিক বৈষম্য, সরকারি খাতের ভূমিকা ও ভূমি সংস্কার বিষয়ে বিতর্ক এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে, প্যানেলের চেয়ারম্যান কমিশনের মুখ্য অর্থনীতিবিদ এম.এল. কোরেশী দুই বা তিনটি বৈঠকের পরই প্যানেলের আলোচনা হঠাৎ এবং অসময়ে বন্ধ করে দেন।

অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া গড়ে ওঠে। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পার্লামেন্টের এমন কোন অধিবেশনই চলেনি যেখানে বৈষম্য বিষয়টি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল না। ১৯৬২ সালে আইয়ুবের সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতারা বাঙালি অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বৈষম্যের পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করেন। ১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচী মূলত: আঞ্চলিক অসমতাকে ভিত্তি করেই রচিত হয়। ছয়দফার তিনটি দফা অর্থ, রাজস্ব ও বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা অঞ্চলগুলোর হাতে অর্পণের দাবি জানানো হয়। এতে আঞ্চলিক বৈষম্য রোধ ও সম্পদ পাচার রহিত করার লক্ষে পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে পৃথক মুদ্রা চালুর প্রস্তাব করা হয়।

বস্তুতপক্ষে, ছয়দফাভিত্তিক বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিবাদী আন্দোলন ক্রমশ গণআন্দোলনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনকল্পে ইসলামাবাদে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। উক্ত গোল টেবিল বৈঠকে সদ্যকারামুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা তথা পূর্ব পাকিস্তানের জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফাভিত্তিক দাবি পুনরায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু আইয়ুব খানের মতো স্বৈরশাসকের পক্ষে উক্ত দাবিগুলো মেনে নেওয়া আদৌ

সম্ভব ছিল না। তাই '৬৯ সালের গণআন্দোলনে এবং '৭০ সালের নির্বাচনে ছয় দফাই ছিল মূল ইস্যু। নির্বাচন পূর্বমুহূর্তে "সোনার বাংলা শ্মশান কেন' শিরোনামে আওয়ামী লীগ কর্তৃক তৈরি পোস্টারটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এতে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈষম্যের খতিয়ান তুলে ধরা হলে পোস্টারটি আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়। এবং '৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ব্যাপক লাভবান হয়। পরবর্তী ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্বাঞ্চলকে শোষণের বিষয়টি। অবশেষে বাঙালি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্তি লাভ করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা থেকেই শাসকবর্গ পরিকল্পিত উপায়েই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য নীতি অনুসরণ করেছিল। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তান আধুনিক শিল্পনগরীতে পরিণত হয় আর পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী ও উৎপন্ন পণ্যের বাজারে পরিণত হয়। সরকারের এরূপ বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ দেখা দেয় বাঙালি অর্থনীতিবিদদের মধ্যে। ১৯৬০-এর দশকে বৈষম্যের ও শোষণের বিষয়টি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয় এবং এটি পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার ও প্রেরণার উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, ঢাকা, ভোরের কাগজ প্রকাশনী, ১৯৯৪।
২। আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।
৩। মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা, ইমপ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৮৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। পাকিস্তান আমলে মোট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়–
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি।

২। পাকিস্তান আমলে মোট বৈদেশিক সাহায্য আসে–
(ক) ৫৫০০ মিলিয়ন ডলার (খ) ৬০০০ মিলিয়ন ডলার
(গ) ৬৪৩ মিলিয়ন ডলার (ঘ) ৭০০০ মিলিয়ন ডলার।

৩। পূর্ব পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দ হয়–
(ক) ২৫০০ মিলিয়ন ডলার (খ) ১৯৪১ মিলিয়ন ডলার
(গ) ২৫৫০ মিলিয়ন ডলার (ঘ) ২৯৪১ মিলিয়ন ডলাল।

৪। পাকিস্তানের দু'অংশের জন্য দুই অর্থনীতি তত্ত্ব প্রথম ঘোষণা করেন–
(ক) মাজহারুল হক (খ) রেহমান সোবহান
(গ) এম.এন হুদা (ঘ) আবদুর রাজ্জাক।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। পাকিস্তান আমলে দু'অঞ্চলের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বৈষম্য সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।
২। পাকিস্তান আমলে বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে দু'অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য কি ছিল চিহ্নিত করুন।
৩। দু'অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ডে বৈষম্যের বিষয় বর্ণনা দিন।
৪। পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনে ৬ দফায় কি কি দাবি করা হয় আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সম্পদ বিভাজন নীতি আলোচনা করুন।
২। পূর্ববঙ্গের ওপর পাকিস্তান সরকারের শোষণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করুন। এই শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-২

পূর্ববাংলায় অভ্যন্ত রীণ উপনিবেশবাদ ঃ রাজনৈতিক, সামরিক, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জাতির ওপর বৈষম্যনীতির বিবরণ দিতে পারবেন;*
- *প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য আলোচনা করতে পারবেন;*
- *সামরিক ক্ষেত্রে দু'অঞ্চলের বৈষম্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারবেন;*
- *সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালির ওপর পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;*
- *বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিক্রিয়া আলোচনা করতে পারবেন।*

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পূর্ববাংলা লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদাতো পায়ইনি, বরং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবিতে পূর্ববাংলাকে সুদীর্ঘ ২৪ বছর আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করে। শাসকগোষ্ঠীর এ বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় প্রথমে প্রতিবাদী আন্দোলন এবং শেষপর্যন্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়।

নিম্নে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি উল্লেখিত বিষয়ে বৈষম্যনীতি এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংক্ষেপে আলোচিত হল–

ক. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য নীতি

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের উল্লেখ থাকলেও ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় উল্লেখিত অঞ্চলসমূহ নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী পূর্ববাংলায় বসবাস করলেও এর রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের রাজনৈতিকভাবে মর্যাদা না দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী করে রাখা হয়। আবার ১৯৪৭ সালে নতুন রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা নিজ নিজ দেশের সংবিধানের প্রণয়নের কথা উল্লেখ থাকলেও পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচন হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। ইতোপূর্বে মুসলিম লীগের একাধিপত্য নীতি লক্ষ করে পূর্ববাংলার সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা কতিপয় উদীয়মান রাজনৈতিক নেতা ১৯৪৯ সালে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে মুসলিম লীগের প্রতিপক্ষ হিসেবে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল এ নবগঠিত রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দকে নানাভাবে কটাক্ষ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও সমমনা দলসমূহ যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রধান ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র এ মন্ত্রিসভাকে কখনো সফল হতে দেয়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে জনগণের সম্মুখে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে অনীহা ভাব জাগ্রত করা।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি পশ্চিমাদের এহেন অনীহার কারণে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হতে সময় লেগেছিল নয় বছর। পূর্ববাংলার যথাযথ প্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতিতেই ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়। এ সংবিধানে পূর্ববাংলাকে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম দেওয়া হয় এবং পাকিস্তানকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণার মাধ্যমে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন করা হয়। এ সংবিধানে সমস্ত ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের লোকজনকে পশ্চিমাদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়। এতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও যুক্ত নির্বাচনের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। নতুন সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার স্থলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে পূর্বাঞ্চলের ওপর প্রেসিডেন্টের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ প্রধান সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পুনরায় কেন্দ্র কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হলেও গণতন্ত্রের প্রতি ভীত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের ষড়যন্ত্রের কারণে মাত্র ১৩ মাসের

মাথায় এ মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এরপর বার বার মন্ত্রিসভা গঠন ও বাতিল হওয়ার পালা চলতে থাকলে দেশে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে এবং সম্ভবত পশ্চিমা শাসককূল এ রকম একটা ক্ষণের জন্যই অপেক্ষা করছিল। এরূপ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মাঝে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জা আইন-শৃঙ্খলার অবনতির অজুহাত দেখিয়ে সামরিক আইন জারি করে শাসনতন্ত্র ও মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করেন এবং রাজনৈতিক দল বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। এর ২১ দিন পর আইয়ুব খান মীর্জাকে অপসারিত করে সমুদয় ক্ষমতা নিজ হাতে কুক্ষিগত করেন। এর মধ্যদিয়ে পাকিস্তানে ১০ বছরের জন্য গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে এ অঞ্চলের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

আইয়ুব খান মনেপ্রাণে গণতন্ত্র ও পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী ছিলেন। তাঁর দশ বছরের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অধিকাংশ সময়ই কারাগারে বন্দি জীবন যাপন করেছেন। তিনি তিনবার নির্বাচনের নামে প্রহসন চালিয়েছেন। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রমনা লোকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। ১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে পূর্ববাংলায় গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করেছেন এবং নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে জেলে বন্দি রেখেছেন। তিনি ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মতামত ব্যতীত তাদের ওপর অগণতান্ত্রিক একটি শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেন। তার পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াহিয়া খান বাধ্য হয়ে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান দল আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তাদেরকে সরকার গঠনের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

নির্বাচন ও সরকার গঠন ছাড়াও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বাঙালিদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার থেকে সজ্ঞানে বঞ্চিত করেছিল। সেক্রেটারী ও মন্ত্রীর পদটি ছিল রাজনৈতিক পদ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার শিক্ষিত ও যোগ্যতা সম্পন্ন নাগরিকদের এ পদে নিয়োগ করতো না। মন্ত্রিপরিষদে দেখা যায়, লিয়াকত আলী খানের সময় (১৯৪৭-৫১) মাত্র ৩১.২%, নাজিমুদ্দিনের সময় (১৯৫১-৫৩) মাত্র ৪০%, আইয়ুব খানের সময় মাত্র ৩২%, ইয়াহিয়া খানের সময় মাত্র ৪৫.৫% মন্ত্রী ছিলেন বাঙালি। তবে এসব বাঙালিদের মধ্যে কেউ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাননি। দেখা যায় যে, ১৯৬৪-১৯৬৫ সনে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৭ জন সেক্রেটারির মধ্যে মাত্র দু'জন ছিল বাঙালি তাও আবার ভারপ্রাপ্ত। সম্পদের ভাগাভাগিতে বাঙালিদের অধিকার সম্বন্ধে যেন কেউ কোন কথা বলতে না পারে, সেজন্য বাঙালিদের কোন সময় অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিয়োগ করা হতো না।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও একই চিত্র দেখা যায়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীরা বাঙালিদের পররাষ্ট্র দফতরে নিয়োগ করতো না। কারণ পাকিস্তানি পররাষ্ট্রনীতি একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল চক্র দ্বারা প্রণীত হতো। বাঙালিদের প্রগতিশীল আদর্শকে তারা কখনো মূল্য দিত না। এ কারণে পররাষ্ট্র দফতরে ১০৪ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মচারির মধ্যে মাত্র ৩০ জন ছিলেন বাঙালি। দ্বিতীয় শ্রেণীর নন-গেজেটেড ২০৪ জন কর্মচারীর মধ্যে বাঙালি ছিলেন ৫৫ জন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বৈষম্য নীতির মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীরা বাঙালিদের সকল রাজনৈতিক অধিকার ও পদ থেকে বঞ্চিত করেছিল। তারা এক্ষেত্রে বাঙালিদের দাবি কোন দিনই মেনে নেয়নি।

খ. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ন্যায় প্রশাসনিক বিভাগের বিভিন্ন স্তরে বাঙালিরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যেমন– পাকিস্তান রেলওয়ের ৮ জন বোর্ড ডাইরেক্টরের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিল বাঙালি। রেডিও পাকিস্তান ডিরেক্টরেটে ২০ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার মধ্যে ১৯ জনই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি এবং ১ জন ছিল বাঙালি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি এবং সকল বিভাগের সদর দফতরগুলো ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিদের মধ্যে ৮৪% ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি এবং ১৬% ছিল বাঙালি। ১৯৬৬ সালের তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মচারীদের হার নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো–

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় চাকুরে, ১৯৬৬

	বাঙালি	পশ্চিম পাকিস্তানি
প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েট	১৯%	৮১%
দেশরক্ষা	৮.১%	৯১.৯%
শিল্প	২৫.৭%	৭৪.৩%
স্বরাষ্ট্র	২২.৭%	৭৭.৩%
শিক্ষা	২৭.৩%	৭২.৭%
তথ্য	২০.১%	৭৯.৯%
স্বাস্থ্য	১৯%	৮১%
কৃষি	২১%	৭৯%
আইন	৩৫%	৬৫%

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে আরো কিছু বৈষম্য নীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন কেন্দ্রীয় আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ দফতরে ৮৯ জন এক্সিকিউটিভ অফিসারের মধ্যে মাত্র ১৬ জন ছিল বাঙালি, ৪৫ জন সহকারী আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ১৫ জন আর পশ্চিম পাকিস্তানি ছিল ৩০ জন। জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনে কর্মরত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি

কর্মচারীদের সংখ্যার মধ্যে বৈষম্যের চিত্র ছিল নিম্নরূপ–

জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মচারী

	বাঙালি	পশ্চিম পাকিস্তানি
কেন্দ্রীয় দফতর	৫৫ জন	১১৪ জন
প্রথম শ্রেণীর	৫ জন	১৭ জন
দ্বিতীয় শ্রেণীর	৮ জন	৩১ জন

একই ধরনের বৈষম্য বজায় থাকে বিদেশে পাকিস্তানি মিশনগুলোতেও। বিদেশে পাকিস্তানি মিশনগুলোতে ৮৫% কর্মচারী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি এবং ১৫% ছিল পূর্ব পাকিস্তানি। বিদেশে পাকিস্তানি ৬৯ জন রাষ্ট্রদূতের মাঝে ৬০ জন দূত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের জনসংখ্যা অনুপাতে কমসংখ্যক নিয়োগ ছাড়াও প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় নিয়োগ, বদলী ও বেতনের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হতো।

গ. প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য

১. **সামরিক:** সামরিক, নৌ এবং বিমান বাহিনী নিয়ে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তানের শাসকবর্গ ছিল স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্র বিরোধী। তারা পূর্ববাংলার অধিবাসীদের গণতান্ত্রিক আদর্শ ও স্বাধীনচেতা মানসিকতাকে ভয় পেতো। তারা বাঙালির অতীত সাহসিকতার কথা স্মরণ করে তাদেরকে দুর্বল করে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা বুঝতো ও জানতো বাঙালি সুযোগ পেলে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। তাই কৌশলে প্রতিরক্ষা বিভাগের চাকরিতে বাঙালিদের কমসংখ্যক নিয়োগ করা হতো। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী- সর্বক্ষেত্রে এ বৈষম্যনীতি পরিলক্ষিত হয়।

সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। অফিসার পদে বাঙালিদের খুব কম নিয়োগ করা হতো। নিয়োগের সময় ৪/৫ জন বাঙালি সুযোগ পেতো। ১৯৬৬ সালে দেখা যায়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মোট ১৭টি উচ্চপদস্থ সামরিক পদের মধ্যে সেনাবাহিনীর জেনারেল, ২টি লেফট্যানান্ট জেনারেল ও ১৪টি মেজর জেনারেলের মধ্যে মাত্র মেজর জেনারেল পদে ছিল একজন বাঙালি। সামরিক অফিসারদের মধ্যে ৫% ছিল বাঙালি আর বাকি ৯৫% ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। শুধু অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে নয়, সাধারণ সৈনিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাঙালিদের সুযোগ ছিল সীমিত। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫,০০,০০০ সদস্যের মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ২০,০০০ জন অর্থাৎ মাত্র ৪%।

২. **নৌবাহিনী:** নৌবাহিনীতে ১৯% টেকনিক্যাল লোক ছিল বাঙালি এবং বাকি ৮১% ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। নন-টেকনিক্যাল লোকের মধ্যে বাঙালি ছিল ৯% জন।

৩. **বিমান বাহিনী:** বিমান বাহিনীতেও বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য নীতি অনুসরণ করা হয়। বিমান বাহিনীতে মাত্র ১১% বাঙালি পাইলট অফিসার এবং ১.৭% বাঙালি টেকিনিশিয়ান ছিল। পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের মোট ৭,২৮০ জন লোকের মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ২৮০ জন এবং পি.আই.এ'র ১০ জন পরিচালকের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন বাঙালি এবং ৫ জন এরিয়া ম্যানেজারের মধ্যে সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের ১০৩ জন বিমানবালার মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিল বাঙালি।

শুধু সৈনিক ও অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, পূর্বাঞ্চলের জন্য যথাযথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান কখনো দৃষ্টিপাত করেনি। ফলে পুর্ববাংলার সীমান্ত সবসময় অরক্ষিত থাকতো। বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। এ সময় পূর্ববাংলা দীর্ঘদিন যাবৎ অরক্ষিত ছিল। আবার পাকিস্তানের সামরিক, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় নিয়োগ, বদলীর ক্ষেত্রে বাঙালিরা হয়রানির শিকার হতো। শুধু তাই নয়, বেতন-ভাতা, বদলী প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো।

ঘ. শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাঙালিরা সুস্পষ্ট বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পশ্চিমা শাসকচক্র বাঙালিদের অশিক্ষিত রেখে তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে শাসক ও শোষক শ্রেণী গড়ে তোলাই ছিল তাদের লক্ষ। তাদের ভয় ছিল বাঙালিরা শিক্ষিত হলে চাকরিসহ প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে এবং দেশ শাসনে অংশীদারিত্ব দাবি করবে। এজন্য পূর্ব পাকিস্তানে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ওপরন্তু এ অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারতার গতিকে রুদ্ধ করে রাখার লক্ষে নানা ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এরমধ্যে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা চালু, আরবি অক্ষরে বাংলা পাঠদান চালু প্রভৃতি হীন ষড়যন্ত্র উল্লেখযোগ্য। অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। পাকিস্তান সরকার তার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষে প্রতিবছর শিক্ষাখাতে বরাদ্দ রাখার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করতো। নিম্নে ছকের মাধ্যমে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে কয়েক বছরের শিক্ষাখাতে বরাদ্দের বৈষম্যমূলক চিত্র তুলে ধরা হলো–

শিক্ষাখাতে বাজেট, ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬২-৬৩ সাল

	পশ্চিম পাকিস্তান		পূর্ব পাকিস্তান	
অর্থ বছর	মোট বাজেট	শিক্ষাখাতে বরাদ্দ	মোট বাজেট	শিক্ষাখাতে বরাদ্দ
১৯৪৮-৪৯	২৭৯.৫ কোটি	৩৫.৪ কোটি	১৬২.১ কোটি	১৯.৪ কোটি
১৯৫১-৫২	৪১১.৫ কোটি	৪৯.২ কোটি	২০১.৬ কোটি	২১.৫ কোটি
১৯৫৬-৫৭	৬১৩.১ কোটি	১০০.৬ কোটি	৩০৩.৮ কোটি	২২.৫ কোটি
১৯৬০-৬১	৮৪৭.২ কোটি	১২১.৬ কোটি	৪৮৯.৫ কোটি	৬১.৯ কোটি
১৯৬২-৬৩	১৩৪৯.৩ কোটি	২০৩.৪ কোটি	৭৪৫.২ কোটি	৭৬.৫ কোটি

শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্যমূলকনীতি অনুসরণ করার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা প্রসারের গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ। ফলে এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম। নিম্নে ছকের মাধ্যমে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র/ছাত্রীর বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরা হল–

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৮-৬৯ সাল

	১৯৪৭/৪৮		১৯৬৮/৬৯	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	পঃ পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পঃ পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান

প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮,৪১৩টি	২৯,৬৬৩টি	৩৯,৪১৮টি	২৮,৩০৮টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৫৯৮টি	৩,৪৮১টি	৪,৩৭২টি (১৯৬৫-৬৬)	৩,৯৬৪টি(১৯৬৫-৬৬)
কলেজ	৪০টি	৫০টি	২৭১টি	১৬২টি
মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়	৬৫৮ জন	১,৬২০ জন	১৮,৭০৮ জন	৮,৮৩১ জন

উপর্যুক্ত ছকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। তার সাথে বিজ্ঞানীর সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৪৭-৪৮ সালের তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে ২৯ গুণ বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব পাকিস্তানে একই সময় বিজ্ঞানীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৫ গুণ।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানকে উৎসাহ দেয়ার জন্য সরকার বস্তুতপক্ষে কিছুই করেনি। এক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় ছিল যথাক্রমে ২০% ও ৮০%। এ ধরনের বৈষম্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে গবেষণার ক্ষেত্রে তেমন উন্নতি হয়নি যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে হয়েছিল। পাকিস্তানের ১৬টি গবেষণা কেন্দ্রের ১৩টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। আবার, ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষা দফতর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সর্বমোট ৩৫টি বৃত্তির মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানি ছাত্রদের ৩০টি বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল এবং বাকি ৫টি পেয়েছিল বাঙালি ছাত্ররা।

ঙ. সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যও প্রকট রূপ লাভ করেছিল। সরকারের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও পরিকল্পনাগত বৈষম্যের কারণে পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের সমাজ জীবন ছিল দু'ধরনের। শাসক মহলের উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালিদেরকে অভাব-অনটনে ও রোগগ্রস্থ রাখতে পারলে তারা রাজনীতিতে সক্রিয় হতে পারবে না। এজন্য কৌশলে পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা হতো এবং তা বাঙালিদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে রাখার চেষ্টা করা হতো। রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, ডাকঘর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি সুবিধা ভোগ করতো। আবার বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল পশ্চিমাদের সেবার লক্ষে। যুবসমাজের উন্নতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। ফলে সার্বিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত ছিল।

চ. সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও নিপীড়ন

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি সুবিধা ভোগ করতো। পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র উল্লেখযোগ্য খেলার মাঠ ছিল ঢাকা স্টেডিয়াম। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে এ ধরনের অনেকগুলো স্টেডিয়াম ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে খেলাধুলার জন্য কোন ভাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না। সরকার কখনোই এ ব্যাপারে বাঙালিদের উৎসাহ দেয়নি।

এছাড়াও, পূর্ব পাকিস্তানে বৃদ্ধ ও শিশুদের মানসিক ও শারীরিক উন্নতির জন্য ভাল পার্ক, অবসর বিনোদনের স্থান, শিশুপার্ক ইত্যাদির অভাব ছিল। এ অঞ্চলে যুবকদের আনন্দ বিনোদনের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল।

সাংস্কৃতিক বৈষম্যের তুলনায় বাঙালিদের ওপর সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ছিল খুবই অমানবিক। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণে পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে দু'ধরনের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিরাজমান ছিল। কিন্তু শাসক মহল শুরু থেকেই বাঙালিদের সাংস্কৃতিকে মুছে ফেলে উর্দু সংস্কৃতিকে এদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা চালায়। তাই ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের মাত্র ৭% লোকের ভাষা উর্দুকে ৫৬% লোকের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে চাইল। অবশ্য এক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার দামাল ছেলেরা শাসকচক্রের হীন চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছিল। বাঙালির সংস্কৃতির ওপর আবার আঘাত আসে ১৯৫৬ সালে। এ বছর পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান । বাঙালি সংস্কৃতির ওপর বড় ধরনের আঘাত আসে ১৯৬৭ সালে। এ বছর আইয়ুব সরকার রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং একই বছর 'বাংলা নববর্ষ' উদযাপনও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এছাড়া সরকার সর্বদা বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকতো। কিন্তু সরকারের এরূপ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালি সর্বদা সচেতন ও সক্রিয় ছিল।

ছ. বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

বেশ কয়েকটি পর্যায়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়–

১. ভাষা আন্দোলন: পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় প্রথম প্রতিবাদ গড়ে ওঠে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে নিয়ে। দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরপরই এর রাষ্ট্রভাষা নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাকিস্তানের ৫৬% লোকের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে এর বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এ প্রতিবাদ ক্রমে প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপলাভ করে এবং অবশেষে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন পাকিস্তান বিরোধী সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে পরিণত হয়। বস্তুতপক্ষে ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়েই বাঙালি পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে একত্রিত হওয়ার শিক্ষা লাভ করে এবং ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারণ করে। ভাষা আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শক্তির বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম বিজয়।

২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী আন্দোলন: পাকিস্তানের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির দ্বিতীয় প্রতিবাদ ছিল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা। এর মাধ্যমে বাঙালি প্রমাণ করল যে, ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ বাঙালিদের পরম শত্রু।

৩. আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন: ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করার বিরুদ্ধে বাঙালিরা আবার প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। তবে এ সময় রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ও দলীয় নেতাদের গ্রেফতার করার ফলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু এর মাঝেও ছাত্র সংগঠনগুলো নতুন আঙ্গিকে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্যদিয়ে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় পরবর্তী বড় ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯৬২ সালে। কতগুলো ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। প্রথম ঘটনা হচ্ছে, ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ স্বরূপ ৩১ জানুয়ারি পূর্ববাংলার ছাত্র

সমাজের আহ্বানে দেশব্যাপী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধর্মঘট পালন করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফেব্রুয়ারির প্রথম ৫ দিন অনবরত ধর্মঘট হয়। দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রণয়ন। আইয়ুব খান পূর্ববাংলার কোন প্রতিনিধির অংশীদারিত্ব ব্যতীত নিজের মনগড়া সংবিধান বাঙালির ওপর চাপিয়ে দিতে চাইলে আন্দোলন নতুন গতি লাভ করে। ফেব্রুয়ারি মাসে শাসনতন্ত্র ঘোষিত হলেই ২৫ জুন পাকিস্তানের ৯ জন শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা আইয়ুবের ঈস্বস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দেন। তাঁরা এ শাসনতন্ত্রকে অকেজো বলে ঘোষণা দেন। এর ফলে আন্দোলন আরো জনপ্রিয়তা লাভ করে। '৬২ সালের তৃতীয় উত্তেজনাকর ঘটনা ছিল শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট। পাকিস্তানের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতি প্রণয়নের লক্ষে আইয়ুব খান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক এস.এম. শরীফকে প্রধান করে একটি কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের রিপোর্টে পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কতগুলো হটকারী নীতি সুপারিশ করা হয়। যেমন– অবৈতনিক শিক্ষা বাতিল, আরবি হরফে বাংলা চালু ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে, কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে যা আর কখনো থামে নি।

৪. **ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনঃ** পাকিস্তান সরকার কর্তৃক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো কঠোর প্রতিবাদ হচ্ছে ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির স্বায়ত্তশাসন ও ন্যায্য অধিকার সম্বলিত ছয় দফাভিত্তিক দাবি উত্থাপন করেন। এগুলোর সংক্ষিপ্তরূপ ছিল নিম্নরূপ–

ক. পূর্ববাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি।

খ. কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি।

গ. পূর্ববাংলা থেকে মূলধন পাচার রোধকল্পে পৃথক মুদ্রার প্রচলন বা বিশেষ শর্তে একক মুদ্রা চালু।

ঘ. কর, ট্যাক্স, খাজনা ধার্য ও আদায়ে আঞ্চলিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদান।

ঙ. অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখা এবং

চ. পূর্ববাংলার আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের অধিকার প্রদান।

কিন্তু আইয়ুব খানের মতো স্বৈরশাসকের পক্ষে এর কোনটিই মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। ফলে একদিকে ছয় দফাভিত্তিক বাঙালির দাবি ও আন্দোলন জোরদার হতে থাকে, অপরদিকে সরকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বস্তুতপক্ষে ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ববাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে এবং এর চরম পরিণতি ঘটে ১৯৭১ সালে।

৫. আগরতলা মামলা বিরোধী আন্দোলনঃ ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন নস্যাৎ করার লক্ষে সরকার দাবির উত্থাপক শেখ মুজিবুর রহমানসহ মোট ৩৫ জনকে আসামী করে ১৯৬৮ সালে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" নামক এক মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও পহেলা বৈশাখ পালন নিষিদ্ধ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। আগরতলা মামলা এ উত্তেজনার মধ্যে ঘৃতাহুতি দেয়। এ মামলার প্রতিবাদে পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলে এবং এ আন্দোলন চলাকালীন ১৯৬৯ সালে ২০ জানুয়ারি ছাতনেতা আসাদ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি জেলে আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যার প্রতিবাদে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন প্রচন্ড গণঅভ্যুত্থানে

পরিণত হয়। আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান সকল মামলা প্রত্যাহার এবং আসামীদের মুক্তি প্রদানসহ শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর মাধ্যমে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়।

৬. ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও পাকিস্তানের স্বৈরশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। তার এরূপ হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালিদেরকে পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ২৫ মার্চ বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের অতর্কিত হামলা ও নির্বিচারে হত্যার প্রতিবাদে শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। অবশেষে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বীর বাঙালি পশ্চিমা শোষক, নিপীড়ক ও নির্যাতনকারী সরকারকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করেছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষে উপনীত হয়েছিল।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সূচনালগ্ন থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলাকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে বিবেচনা করে এ অঞ্চলের মানুষকে রাজনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কৌশল অনুসরণ করতে থাকে। বাঙালি তাদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নকে কখনো সহজে মেনে নেয়নি। অবশেষে চরম ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে পাকিস্তানের শোষণ ও নির্যাতনের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে তথা স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়–
(ক) ১৯৪৮ সালে (খ) ১৯৪৯ সালে
(গ) ১৯৫০ সালে (ঘ) ১৯৫২ সালে।

২। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন–
(ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
(গ) এ.এ(ক) ফজলুল হক (ঘ) মওলানা আ. হামিদ খান ভাসানী।

৩। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেন–
(ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (খ) আবুল মনসুর আহমদ
(গ) এ.কে. ফজলুল হক (ঘ) খাজা নাজিমুদ্দিন।

৪। পূর্ববাংলা পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়–
(ক) ১৯৫৬ সালে (খ) ১৯৫৭ সালে
(গ) ১৯৫২ সালে (ঘ) ১৯৫৮ সালে।

৫। জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন–
(ক) জেনারেল পীরজাদার কাছ থেকে (খ) জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছ থেকে
(গ) জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার কাছ থেকে (ঘ) জেনারেল হামিদের কাছ থেকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য সংক্ষেপে লিখুন।

২। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৩। পাকিস্তান আমলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কি কি বৈষম্য করা হয়েছিল তার বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, প্রতিরক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালির ওপর পাকিস্তান সরকারের বৈষম্য নীতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

২। পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরমালাঃ

পাঠ-১ঃ ১। (খ); ২। (গ); ৩। (খ); ৪। (ঘ)।

পাঠ-২ঃ ১। (খ); ২। (ঘ); ৩। (গ); ৪। (ক); ৫। (গ)।